



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 574 - 580

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা কল্পবিজ্ঞানের আখ্যান ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্মিতি

অভয় পাইন

গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : mail2abhaypain@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

science fiction,
future technology,
Science
experiment,
Premendra Mitra,
Ghanada,
Geography.

Abstract

"Science fiction is no more pseudo-science than fiction is pseudo-truth."

- John Wood Campbell in 'Concerning Science Fiction' (1946)

We can classify all types of prose literature by dividing it into two categories: fiction and non-fiction. We can also divide fiction into speculative fiction and the fiction of mainstream. Science fiction is a genre from speculative fiction which tells us about imaginative progress of science and technology based upon a story. It often focussing on the impact of continued advancement of science and technology on society and civilization. The first science fiction story in bengali science fiction is Hemlal Dutta's 'Rahasya'. I have discussed the beginning of the genre in my article. Premendra Mitra was a very famous writer in science fiction writing. His first science fiction novel was 'Pipre Puran' and in 'Ghanada' series was 'Masha'. He wrote his science fiction stories by mixing scientific knowledge with geographical information from home and abroad. I have discussed selected 'Ghanada' stories in my article to prove that Premendra Mitra was a very prominent writer in bengali science fiction writing. As per boundaries of word limit I have discussed very short introduction of the emergence of bengali science fiction.

Discussion

বিজ্ঞান ও কল্পনার অপূর্ব রসায়নে নির্মিত হয় কল্পবিজ্ঞান। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গল্পে কল্পনার অল্প মিশেলে নির্মিত হয় বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প, বিজ্ঞান সুবাসিত গল্প, বৈজ্ঞানিক রহস্য, বিজ্ঞান নির্ভর গল্প প্রভৃতি। কল্পনা অশ্বের রশ্মিকে হাতের মধ্যে রেখেই আরো কয়েক কদম ছুটিয়ে নির্মিত হয় কল্পবিজ্ঞান। তবে কল্পনা অশ্বের রশ্মি হাত থেকে বেরিয়ে গেলে তা আর কল্পবিজ্ঞান থাকবে না তা বিজ্ঞানভিত্তিক উদ্ভট কাহিনিতে পরিণত হবে। অর্থাৎ এই রাশ টানাটা বা গতির হিসেবটা জানা খুব জরুরী। তা না জানার জন্য অনেক ভালো গল্পের কল্পবিজ্ঞানের গল্পে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। ট্রাজেডির ব্যর্থতায় যেমন মেলোড্রামার সৃষ্টি হয় তেমনি কল্পবিজ্ঞানে কল্পনার অতিরেকে সৃষ্টি হয় সায়েন্স ফ্যান্টাসি বা বিজ্ঞান ভিত্তিক উদ্ভট গাল-গল্প।

বিখ্যাত সমালোচক উইলিয়াম উইলসন ১৮৫১ সালে তার ‘A Little Earnest Book Upon a Great Old Subject’ গ্রন্থে ‘science fiction’ শব্দ দুটি ব্যবহার করেন। কারো কারোর মতে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ‘Amazing Stories’ নামক পত্রিকার সম্পাদক হুগো গার্নসব্যাকই ‘science fiction’ শব্দবন্ধটির জন্ম দেন। কেউ কেউ মনে করেন সুপ্রাচীন সুমেরীয় মহাকাব্য ‘গিলগামেশ’ (খ্রিস্টপূর্ব ২১০০) বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর প্রথম উদাহরণ। ১৬৩৪ সালে জ্যোতির্বিদ জোহানেস কেপলারের ‘Somnium’ চন্দ্রাভিযান নিয়ে সায়েন্স ফিকশন লেখা। ১৬২৭ সালে ফ্রান্সিস বেকন লেখেন ‘The Lost Atlantis’। মেরী শেলী ১৮১৮ তে ‘Frankenstein : A Modern Prometheus’ উপন্যাসে গথিক হরর কাহিনীর পরিবর্তে বিজ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান নিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্পকাহিনীর সূচনা করলেন। এরপর বিশ্বসাহিত্যে সায়েন্স ফিকশনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে জুলেভার্ন, এইচ. জি. ওয়েলস্, আর্থার.সি.ক্লার্ক, আইজ্যাক আসিমভ, আর্থার কোনান ডয়েল, এডগার এলান পো প্রভৃতি বিখ্যাত সব লেখকদের হাত ধরে। এই ধারা এখনো অব্যাহত।

১৮৩৫ এ কৈলাস চন্দ্র দত্তের ‘A Journal of Forty eight hours of the year 1945’ প্রথম ভারতবর্ষের ভবিষ্যত ইতিহাস নিয়ে লেখা কল্পকাহিনি। ১৮৪৫ এ শশীচন্দ্র দত্তের ‘The Republic of Orissa : A page from the Annals of Twentieth Century’ দ্বিতীয় ইতিহাস মূলক কল্পকাহিনি। বাংলায় কল্পবিজ্ঞান চর্চা একদিনে হয় নি। প্রথমে বিজ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা তারপর ধাপে ধাপে বিজ্ঞান ভিত্তিক কল্পকাহিনীর চর্চা হয়েছে। সমসাময়িক পত্রিকাগুলি বিজ্ঞান চিন্তার প্রসারে অনেকখানি ভূমিকা নিয়েছিল। ‘মৌচাক’, ‘রামধনু’, ‘সন্দেশ’, ‘কিশোর জ্ঞানবিজ্ঞান’ প্রভৃতি পত্রিকাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান চিন্তা ও চেতনার প্রসারে। একেবারে গোড়ার দিকে ১৮৬৪-তে প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিজ্ঞান গ্রন্থ ‘বালবোধ’, কাঙাল হরিনাথের প্রথম মৌলিক শিশু উপন্যাস ‘বিজয় বসন্ত’ (বিকল্প ইতিহাস বা alternative history এর সূচনা), বিজ্ঞান শিক্ষক জগদানন্দ রায়ের ‘বাংলার কীটপতঙ্গ’ প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ‘বিবিধার্থ সংগ্রহ’, ‘পশ্চাবলী’, ‘সন্দেশ’, ‘জ্ঞান বিজ্ঞান’, ‘মৌচাক’, ‘রামধনু’, ‘এ যুগের কিশোর বিজ্ঞানী’ প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ, বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা, দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনি, বিজ্ঞানের মজাদার গল্প, আবিষ্কারের গল্প প্রকাশিত হত। ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় বিশেষভাবে প্রকাশিত হত ‘বিজ্ঞানের আসর’ ও ‘প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর’। বাংলার বিভিন্ন পত্রিকাগুলোকে অবলম্বন করেই বিজ্ঞান চিন্তা চেতনার প্রসার হতে শুরু করে। বাংলা ভাষায় এবং ভারতের প্রথম সায়েন্স ফিকশন পত্রিকা ‘আশ্চর্য’। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ এর জানুয়ারি মাসে। আকাশ সেন ছদ্মনাম নিয়ে অদ্রীশ বর্ধন এই পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সায়েন্স ফিকশন এর বাংলা পরিভাষা ‘কল্পবিজ্ঞান’ তিনিই নির্মাণ করেন। বর্তমানে ‘কল্পবিশ্ব’ পত্রিকা উত্তরসূরি হিসাবে পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

বাংলায় কল্পবিজ্ঞানের প্রসারের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ও সামাজিক অবস্থার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতেই হয়। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দু কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটি তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর মনে বিজ্ঞান চিন্তার বিস্তার ঘটায়। বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান চেতনার বিস্তারে অক্ষয়কুমার দত্ত, গুরুদাস ব্যানার্জী, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ মনিষীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠা করেন Indian Association of cultivation of science ১৮৭৬ এ। এ সময়ের বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা বাঙালীদের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটান। ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গল, ব্রাহ্ম আন্দোলন মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান মানসিকতার প্রসার ঘটায়। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ও সেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে করায়ত্ত্ব করে দেশে বিদেশে ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপন তৎকালীন বাঙালিকে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তৎকালীন স্কুল কলেজে বিজ্ঞানচর্চার চিন্তা বা গবেষণার হতো খুবই অল্প কিন্তু শিক্ষিত মানুষের মনে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা বেড়েই চলছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি ঘটে। আয়ের বিভিন্ন দিক ও উৎস খুলে যায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির প্রভাব পড়ে সাহিত্যেও। সাহিত্যে বিজ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি শুরু হল বিজ্ঞানের মজাদার গল্প ও আবিষ্কারের গল্পের। বিদেশের পণ্ডার সায়েন্সের আদলে প্রথমে সহজ ভাষায় সহজ করে বিজ্ঞান চর্চা আরো অনেক পরে বিজ্ঞানকে কল্পনার আশ্রয়ে অনেকখানি প্রসারিত করে শুরু হল কল্পবিজ্ঞান চর্চা।

বাংলা কল্পবিজ্ঞানের প্রথম লেখা হিসাবে পাওয়া যায় হেমলাল দত্তের ‘রহস্য’। ১৮৮২ তে দুটি পর্বে প্রকাশিত হয় ‘সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ’ পত্রিকায়। জগদীশ চন্দ্র বসুর ‘পলাতক তুফান’ (১৮৮৬) পৃষ্ঠটান নিয়ে লেখা কল্পবিজ্ঞানের গল্প। ১৮৭৯ এ জগদানন্দ রায় বিজ্ঞানের শিক্ষক কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখেন ‘শুক্র ভ্রমণ’। যদিও এটি লেখা হয়েছিল প্রকাশের বাইশ বছর আগে। সুকুমার রায় আর্থার কোনান ডয়েলের ‘The Lost World’ অবলম্বনে প্যারোডি লেখেন ‘হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি’। অন্যদিকে বিকল্প ইতিহাস, ইউটোপিয়া প্রভৃতি উপাদান নিয়েও কল্পবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয় যেমন, বেগম রোকেয়ার ‘Sultanas Dream (feminist utopia)’, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫), (বিকল্প ইতিহাস)’, অঙ্গুরীয় বিনিময় (১৮৫৭) (বিকল্প ইতিহাস)’, পরশুরামের ‘উলট পুরাণ’ (বিকল্প ইতিহাস), ‘গা-মানুষ জাতির কথা’ (বিপর্যয় পরবর্তী ইতিহাস), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ‘মঙ্গল পুরাণ’ (১৯৩১) (first dilocalised local) প্রভৃতি।

কল্পবিজ্ঞানের যশস্বী লেখক হিসেবে আমরা যাদের জানি তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তার প্রথম কল্পবিজ্ঞান বা বিজ্ঞান কল্পকাহিনী রচনা হল মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ও ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের উৎসাহে তাদের ‘রামধনু’র পাতায় ‘পিঁপড়ে পুরাণ’ (১৯৩০)। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত বিজ্ঞান কল্পকাহিনী নিয়ে আলোচনা না করে আমি শুধু ঘনাদা চরিত্রটি নিয়ে যেসব কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি লেখা হয়েছে তার আলোচনা করে আলোচনার পরিধিকে সীমায়িত রাখছি।

১৯৪৫ সালে বাংলা ১৩৫২ বঙ্গাব্দের দেবসাহিত্য কুটিরের পূজা সংখ্যা ‘আলপনা’য় আবির্ভাব ঘটল ঘনাদার ‘মশা’ গল্পের মাধ্যমে। ঘনাদার গল্প বলার ঢঙ বা মজলিস সাহিত্য ঘরানা তার পূর্বে আমরা পাই ত্রৈলোক্যনাথের ‘ডমরুধর’ ও প্রমথ চৌধুরীর ‘নীললোহিতের’ মধ্যে। ঘনাদার চরিত্রটি বিদেশী ফিকশনের নায়ক চরিত্রের অনুসরণে তৈরি। লেখক নিজে তা স্বীকার করেছেন। বিদেশী ফিকশনে যেমন পৃথিবীকে বাঁচানোর দায়িত্ব নায়কের তেমনই কঠিন ও অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতিতে ঘনাদা উপস্থিত হয়ে পৃথিবীকে বাঁচিয়েছেন, যুদ্ধ খামিয়ে দিয়েছেন। স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের ক্ষুরধার শাণিত বুদ্ধি প্রচণ্ড কর্মোদ্যোগী প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের মতো। অনেকেই ঘনাদার গল্পগুলিকে আষাঢ়ে গল্প বা tall tale বলেছেন, কিন্তু তিনি বিজ্ঞানের সম্ভাব্যতার সীমানা কোনদিন ছাড়িয়ে যান নি। ঘটনার বিন্যাসটাই স্বকপোলকল্পিত কখনো বা উদ্ভট। ঘনাদার গল্পগুলি তৈরির সময়ে প্রথমে তিনি কোন বৈজ্ঞানিক বিষয় বা সূত্র নিয়ে লিখবেন তা স্থির করেন। তারপর স্থান নির্বাচন করেছেন একেবারে গ্লোব ধরে। যে স্থানটিকে তিনি গল্পের প্রেক্ষাপট করেছেন সেই ভৌগোলিক স্থানের অবস্থান একেবারে অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ সহ বর্ণনা করেছেন, যেমন ‘নুড়ি’ গল্পের ভৌগোলিক স্থান দক্ষিণ গোলাধ্বের নিউ হেরাইডিজের অন্তর্গত একাটার কাছে যেখানে ২০° অক্ষরেখা ও ১৭০° দ্রাঘিমা কাটাকুটি করেছে সেখানে আনিওয়া দ্বীপের সংলগ্ন আর একটা ছোট দ্বীপ ‘নিকিউ’। বর্ণিত স্থানগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব, প্রাকৃতিক তথ্য, সম্পদ, ভাষা, খাদ্যসামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, জনজীবন, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সবই তুলে ধরেছেন। তার গল্পের বিষয় বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর হয়েছে। জীব বিজ্ঞান, পরমাণু বিজ্ঞান, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণের মধ্যে স্বচ্ছন্দ পদচারণা করেছেন। কল্পবিজ্ঞানের সাধারণ যে সব বিষয় যেমন বহির্জাগতিক প্রাণ বা প্রাণী, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবট, জৈব প্রযুক্তি, জিন পরিবর্তন, অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন আকাশযান, ক্লাক হোল, স্পেস ড্রাইভ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার ও তাদের ব্যবহার প্রভৃতির প্রায় সবই তার গল্পের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়বস্তু অনুসারে উদাহরণ সহ আলোচনা করা যাক।

প্রথমে ‘মশা’ গল্পের কথা ধরা যাক। ঘনাদার এই গল্পের বিষয় জীব বিজ্ঞান। মশার শরীরে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের ফলে তার জীনগত পরিবর্তন ঘটেছে। সেটি অত্যন্ত ভয়ংকর ও বিষাক্ত হয়ে ওঠে। দুষ্ট বুদ্ধির লোকেরা তাদের স্বার্থের জন্য এই ধরণের মশা ব্যবহার করে এবং শেষ পর্যন্ত ঘনাদা এই সংকট থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ‘পোকা’ গল্পের বিষয়বস্তুও অনেকটা এরকমই। সেখানে রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করার ফলে পোকারা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সিস্টোসার্ক গ্রিগেরিয়া তথা পঙ্গপালের শরীরের এরূপ পরিবর্তন জীব বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্যান্য কল্পবিজ্ঞানের গল্পেও এরকম বিষয় আছে।

‘কাঁচ’ ও ‘হাঁস’ গল্পদুটি পরমাণু বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে লেখা কল্পবিজ্ঞানের গল্প। ‘কাঁচ’ গল্প থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার জার্মানির পরমাণু বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রগতির কথা জানা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পরমাণু বোমা তৈরী

করলেও জার্মানি তাদের থেকে এগিয়ে ছিল। ভারত যখন পরমাণু বিজ্ঞানের চর্চায় একেবারেই গোড়ার দিকে তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র ‘কাঁচ’ গল্পে তেজস্ক্রিয় মৌল ইউরেনিয়ামের কথা বলেছেন। ‘হাঁস’ গল্পে হাইড্রোজেন মনোক্সাইড বা সাধারণ জলের বদলে ভারী জল বা ডায়টেরিয়াম অক্সাইডের কথা বলেছেন যা যুগের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। ‘ফুটো’ গল্পে ফোর্থ ডাইমেনশনের কথা বলেছেন। যা ভবিষ্যতের কম্পিউটার 3D গেমের পূর্বাভাস দেয়।

‘ছুঁচ’ গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র ইতিহাস, ভূগোল, রসায়নবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতির অজস্র তথ্য দিয়েছেন। ‘ধুলো’ গল্পে সিলভার আয়োডাইড যা দিয়ে অনাবৃষ্টির দেশে বৃষ্টি নামানো হয় তা দিয়ে তিনি ‘ফ্লোরা-ডোরা’-র মতো প্রলয়ঙ্করী হারিকেন ঝড়কে থামিয়ে দিয়েছেন। ‘টল’ গল্পে টল বলতে বুঝিয়েছেন ভারী জল বা ডিউটেরিয়াম অক্সাইডকে যা থেকে হাইড্রোজেন বোমা তৈরী হয়। ‘টল’ তার থেকেও বেশী কিছু যার একটি বা দুটি ফোঁটাই জমানো হচ্ছে কোথাও। তাকে ঘনাদা খুঁজে পেয়েছেন মধ্য অস্ট্রেলিয়ার বাঁজা পাহাড় ম্যাকডোনেল রেঞ্জের একটা চোরা উপত্যকায়। সহজভাবে ‘টল’ সম্বন্ধে জানিয়েছেন –

“টল আমাদের জলেরই জাতভাই, তবে জলের চেয়ে শতকরা চল্লিশ ভাগ ভারি আর দশগুণ আঠালো। রাসায়নিক ফর্মুলা H_2O ই বটে কিন্তু তার অণুগুলি এমন লম্বা শেকল বাঁধা যে তার চেহারা চরিত্র একটু তরল গোছের আঠালো রাবারের মতো। বৈজ্ঞানিকদের অনেকেরই ভয় যে, কোনরকম মেশামিশির সুযোগ থাকলে আমাদের সব সাধারণ জল ঐ ছোঁয়াচ লেগে টল হয়ে ওঠে পৃথিবীকে গুরুত্বহীন মতো এমন অসহ্য গরম করে তুলবে যে তাতে প্রাণের অস্তিত্বই হবে অসম্ভব।”^১

‘কালো ফুটো সাদা ফুটো’ গল্পে প্যারালাল ওয়ার্ল্ড বা সমান্তরাল বিশ্বের কথা বলা হয়েছে। ‘কালো ফুটো’ বলতে তিনি ব্ল্যাক হোল বুঝিয়েছেন। ব্ল্যাক হোলের তত্ত্ব সহজভাবে বুঝিয়েছেন –

“কালো ফুটো এমন এক প্রচন্ড মাধ্যাকর্ষণের গর্ত যেখানে মাধ্যাকর্ষণের টানে কাছাকাছি গ্রহ তারা সবকিছু এমন তলিয়ে যায় যে সেখান থেকে আলো কি বেতার তরঙ্গ ও বাইরে আসতে পারে না।”^২

Parallel universe যে সম্ভব তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন –

“বিশ্ব নয়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই বলি। সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোনও অজানা নিয়মে কিছুক্ষণের জন্য তোমাদের ব্রহ্মাণ্ডের সাদা ফুটো দিয়ে অন্য জগতের কিছুক্ষণের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছে। তিন ডাইমেনশন বা মাপের জায়গায় চারের কি পঞ্চম ডাইমেনশনের কল্যাণে কিছুক্ষণের জন্য এক জায়গায় পরস্পরকে দু-জগত ছুঁয়েই ফেলেছে। কিন্তু সে শুধু সামান্য একটু সময়ের জন্য।”^৩

‘লাটু’ গল্পে ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত চাকতির কথা পাওয়া যায়। ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত চাকতি UFO নামে একসময় সাড়া জাগিয়েছিল।

‘নাচ’ গল্পে ঘনাদা মৌমাছিদের নাচ দেখে ডাঙার স্বপ্নান পেয়েছেন। ‘কাদা’ গল্পে ব্রেজিলের মতো এসসো অঞ্চলের রিও আরাগুয়াইয়া নদীর দেশে ‘সাইনোলেবিয়াস বেলডি’ নামক খুদে মাছ দিয়ে মশার বংশ নাশ করেছেন ঘনাদা। এই মাছটি আমাদের পরিচিত খলসে মাছের মতো। ‘কাঁটা’ গল্পে অ্যাকাছাস্টার প্লানচি নামক এক বিকট জাতের তারা মাছ প্যাসিফিকের প্রবাল নষ্ট করে দেয়, তাকে শিঙে-শাখ ট্রাইটন দিয়ে ঘনাদা নিকেশ করে। ‘পৃথিবী বাড়ল না কেন’ গল্পে ড. লেভিনের গবেষণা করছেন পৃথিবীকে আরও বিস্তৃত করার জন্য। তার জন্য মানুষকে ছোট করতে হবে। মানুষ যদি এখনকার মাপের বদলে সমস্ত বর্তমান বিদ্যা বুদ্ধি নিয়ে ছোট হতে হতে ইঁদুর আর তারও পরে পিঁপড়ের মতো ছোট হয়ে যায় তাহলে পৃথিবী তার পক্ষে কী বিরাটই না হবে। জৈব-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষকে আকারে ছোট করার উপায় ড. লেভিন খুঁজেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘনাদার হস্তক্ষেপে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। ‘বেড়াজালে ঘনাদা’ গল্পে জুয়ানের গোরু-ঘোড়ার পালে মড়ক লাগে, ঘনাদার মতে এটি হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক যেটি ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের কামড়ে হয়। পাউলো এই চক্রান্ত করেছিল। ঘনাদা ডাইফেনা ডিয়োন আধ চামচ ভেসলিনের সঙ্গে 50 গ্রাম ওষুধ মিশিয়ে ভ্যাম্পায়ারের গায়ে লাগিয়ে দেয়। বাদুড়েরা পরস্পরের গা চাটাচাটি করে মারা যায়। ভ্যাম্পায়ারদের গুহার মুখে জাপানি কুয়াশার জাল টাঙিয়ে ঘনাদা তাদের ধরতে পেরেছিলেন। ‘ঘনাদার হিজ্ বিজ্ বিজ্’ গল্পে ঘনাদা তিমির বংশলোপ রোধ করার চেষ্টা

করেছিলেন। তিমি শিকারিরা তিমির চর্বি থেকে বহু জিনিস তৈরি হওয়ার জন্য তিমি শিকার করে। তিমি, সাগর ভোঁদড়, মেরু শেয়াল প্রভৃতির বংশ এতে লোপ পেতে শুরু করে। স্পার্ম তিমি শিকারীদের কাছে সবচেয়ে দামী। ঘনাদা বিকল্প ব্যবস্থা করে অ্যারিজোনার মরুভূমিতে পাওয়া বুনো সিম দিয়ে। রেড ইন্ডিয়ানরা বলতো হো-হো-বা। এতে পেটের ওসুখ থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত সেরে যায়। স্পার্ম তিমির মাথার তেলের সঙ্গে এই বুনো সিম হো হো বার আশ্চর্য মিল আছে।

‘হ্যালির বেচাল’ গল্পে তার সাথে 100 মিটার দূর থেকে মোলাকাত ও খবর আনার জন্য 960 কিলোগ্রাম ও 3 মিটার লম্বা রকেট ছোঁড়া হয়েছে। হ্যালির ধূমকেতুর ভিতরে পাওয়া যাবে অসাধারণ টি. ভি ক্যামেরা যা ধূমকেতুর ভেতরে গাঁথা হয়ে আছে যা খবর দেবে 76 বছরের মহাকাশ পরিক্রমার। ঘনাদার বিশ্বাস –

“মহাকাশের মূলকে অন্ধকার কত কী যে লুকিয়ে রাখে কে জানে, মানুষের ও আগে দূরদর্শন বা রকেট যন্ত্র আবিষ্কারের মতো উন্নত সভ্য প্রাণির হয়তো সেখানে কোথাও বাস। তাদের দূরদর্শন যন্ত্র থেকেও তাদের বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করতে পারি।”^৪

‘মৌ-কা-সা-বি-স থেকে রসোমালাই’ গল্পে ক্লোরোফিলের ছোঁয়াচে মহামারীর জন্য ভাইরাস ছড়াতে চায় দুষ্টবুদ্ধির লোকেরা। ঘনাদা প্রফেসর নিভোচির সাহায্যে তা রোধ করে। ‘মৌ-কা-সা-বি-স একবচন না বহুবচন’ গল্পে একধরনের আগাছা কচালি যা হাইড্রোকার্বনের উৎস তা থেকে বিকল্প শক্তির কথা বলা হয়েছে। ঘনাদার ব্যাখ্যা হল –

“কচালিতে প্রচুর হাইড্রোকার্বন আছে কিন্তু সেটা হল মোটা মাল, তাতে দু শিকলি গ্রস্থিতে ১৪টা করে কার্বন অ্যাটম; ২৪টা করে হাইড্রোজেন অ্যাটমের সরু জোড়া। কোনও ইঞ্জিন চালাবার পক্ষে তা অচল।”^৫

“এই অচল হাইড্রোকার্বন হল খুচরো চোলাই, অর্থাৎ ফ্ল্যাকশনাল ডিস্টিলেশন করে সরল বা সচল করতে হলে একটা ক্যাটালিস্ট দরকার।”^৬

ঘনাদা সম্পর্কিত উপন্যাসগুলি আলোচনা করা যাক। ‘মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা’ উপন্যাসে ঘনাদা সুরঞ্জন ও বটুকেশ্বরকে নিয়ে উন্মাদ বৈজ্ঞানিক লুটভিকের মহাকাশ যানে প্রায় বন্দী অবস্থায় মঙ্গল গ্রহে পাড়ি দেন। মঙ্গল গ্রহ তার কাছে ‘লাল বালির রাজ্য’ এবং মঙ্গল গ্রহের নাম দেন ‘ধাঁধিকা’। ঘনাদা মঙ্গল গ্রহের প্রকৃতি বলেছেন –

“একেবারে আমাদের পৃথিবীর মতো হাওয়া, বরং আরো নির্মল ও পরিষ্কার ঠিক আমাদের সমুদ্রের ধারের হাওয়ার মতো।”^৭

ঘনাদা মঙ্গলের ইতিহাস বিবৃত করেছেন –

“সেখানে প্রাণের বিকাশ আর বিবর্তন আমাদের পৃথিবীর অনেক আগেই হয়; তারপর আমাদেরই মতো পারমাণবিক যুগে পৌঁছে নিজেদের হিংসা-প্রতিহিংসার যুদ্ধে আর স্বাভাবিক কারণে গ্রহের ওপরটা প্রাণীদের বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। মঙ্গলের সেরা সেরা প্রাণী সেই মাস্টলিকেরা এ-সম্ভাবনার কথা ভেবে অনেক আগে থেকেই মাটির ওপরের স্তরের তলায় সুড়ঙ্গ কেটে সব পাতাল শহর বসাবার কাজ শুরু করে রেখেছিল। হাওয়া ফুরিয়ে জল উবে গিয়ে সূর্যের মারাত্মক আলট্রা-ভায়োলেট আর মহাকাশের কসমিক রশ্মির বর্ষণে ওপরে টিকে থাকা যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন মাস্টলিকদের যারা তখন ও বেঁচেছিল সবাই ঐ পাতাল রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়, কিন্তু সেখানেও নিয়তির নিষ্ঠুরতা থেকে রেহাই পায় না। ওপর ছেড়ে পাতালে নামবার সময় যে মাস্টলিকেরা কমতে কমতে সংখ্যায় অন্তত লাখ দুয়েক ছিল, আমাদের ও গ্রহে নামবার সময় শেষ পর্যন্ত গুটি দশকে এসে পৌঁছেছে।”^৮

পরে আমরা জানতে পারি সেই দশজনের মধ্যে সবাই পরমাসুন্দরী রমণী একটিও পুরুষ নেই, তাই মঙ্গলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ঘনাদা সুরঞ্জন ও বটুকেশ্বরকে মঙ্গল গ্রহে ছেড়ে আসে। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা জালার মতো দেখতে যেটা আসলে তাদের তলা থেকে ওপরে ওঠবার জন্য স্পেস সুট। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা মানুষের মতো দেখতে কেন প্রশ্ন করলে ঘনাদা উত্তর দিয়েছেন –

“লক্ষ লক্ষ বছর আগে মাস্টলিকরাই এসে পৃথিবীতে মানুষ জাতের গোড়াপত্তন যে করেনি তা কে বলতে পারে! মিসিং লিঙ্ক এখনও তো ঠিক পাওয়া যায় নি।”^৯

ঘনাদা জানিয়েছেন আকাশ পথে অনেকক্ষণ ভারশূণ্য থাকার ফলে শরীর থেকে পটাসিয়াম স্বাভাবিকের থেকে বেশী হারে বেরিয়ে যায়। তাই মহাকাশযাত্রীরা অসুস্থ হয়ে যায়। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন –

“ইলেকট্রিক্যাল কনডাকটিভিটি নষ্ট হয়ে, কার্ডিয়াক রিদম্ কেটে যাওয়া। অর্থাৎ হৃদয়ের বৈদ্যুতিক বাহিকা শক্তি দুর্বল হওয়ার দরুণ হৃদয় স্পন্দনের ছন্দপতন ঘটা।”^{১০}

ঘনাদা এই রোগ টেবিলের কাঠের পায়া পুড়িয়ে ছাই তৈরী করে সেই ছাই খাইয়ে সারিয়ে দেন। ঘনাদা এটাও জানিয়েছেন যে লুটভিকের মহাকাশযান চলে ম্যাটার ও অ্যান্টিম্যাটারের তীব্র বিকর্ষণ শক্তির জোরে। অ্যান্টিম্যাটারের হাইড্রোজেন অ্যাটমে একটা প্রোটনের চারিধারে একটা ইলেকট্রন ঘোরে না। নেগেটিভ অ্যান্টিপ্রোটনের চারিধারেই ঘোরে পজিটিভ পজিট্রন। অন্য সব উপাদানই তাই। সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র অ্যান্টিম্যাটারের কথা বলেছেন।

‘তেল দেবেন ঘনাদা’ উপন্যাসে জ্বালানি তেলের বিকল্প শক্তি উৎসের কথা বলা হয়েছে। এই বিকল্প শক্তি যেভাবে পাওয়া যাবে বলে ভাবা হয়েছে –

“মহাকাশে অসংখ্য সূর্যের তাপ ধরবার যন্ত্র-বসানো স্যাটেলাইট ঘুরিয়ে তারই উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তি সূক্ষ্মতীক্ষ্ম বেতার অণু-তরঙ্গ ধরা অণু-তরঙ্গে পৃথিবীর কারবারিদের নিজস্ব সব অণু-তরঙ্গ ধরা অ্যান্টেনা-গ্রিডের ঘাঁটিতে পাঠিয়ে তা থেকে সর্বত্রই নিজেদের লাইনে পাঠাবার মতো হাই-ভোল্টেজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে এই কারবারিরা ভবিষ্যতের দুনিয়াকে নিজের হাতের মুঠোয় রাখবার জন্য এস-এস-পি-এস গড়ে তুলছে।”^{১১}

আবার অন্য বিজ্ঞানীরা কালো ফুটো বা Black hole কেই বিকল্প শক্তি উৎস তৈরির কাজে লাগাবেন ভাবছেন এভাবে –

“ওই খুদে কালো ফুটোর চারধারে কুয়ো বাঁধিয়ে দেবার মতো একটা উপগ্রহের কায়মি চাকতি হিসেব করে মাথা জোখা দূরত্বে লাগিয়ে দিলেই, পাহাড়ি প্রপাতের জল পড়বার বেগ থেকে যেমন, কালো ফুটোর সর্বনাশা টান থেকে তার গলার চাকতিতে বসানো যন্ত্র দিয়ে তেমনই অফুরন্ত অগাধ এনার্জি পৃথিবীতে চিরকাল ধরে জোগান দেওয়া যাবে।”^{১২}

‘মাক্কাতার টোপ ও ঘনাদা’ উপন্যাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র পুরাণ ও বিজ্ঞানকে মিশিয়ে এক আশ্চর্য কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। তিনি মৎস্যাবতারের স্বরূপ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন স্কটল্যান্ডের উত্তরে লকনেস নামে এক হ্রদের ভয়ংকর জলদানব সামুদ্রিক প্রাণি প্লিসিওরাসকে। ঐ হ্রদে এখনও প্রায় শ-দেড়েক প্রাণী জীবিত আছে অথচ যেটির দশকোটি বছর আগেই লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা। এই প্লিসিওরাসের রহস্য ভেদ করার জন্য ঘনাদা ব্যবহার করেছেন ‘গীতগোবিন্দ’ এর একটি শ্লোক –

“প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিতবহিঃ চরিত্রমখ্যেদম্...
কেশব ধৃতমীনশরীর। জয় জগদীশ হরে।”^{১৩}

“প্লিসিওরাস আমাদের ভারতীয় শাস্ত্র পুরাণের আদি মৎস্যাবতার। অর্থাৎ সৃষ্টিতে জীব বিবর্তনের ইতিহাসে এই মৎস্যাবতারই আদি মনুর রক্ষক ও বাহন।”^{১৪}

ঘনাদার মতে আদি মনুর বাহন বা রক্ষক সেই মৎস্যাবতারকে প্রলুব্ধ করে ধরবার জন্য একমাত্র মাক্কাতার টোপই প্রয়োজন। আর সেই মাক্কাতার টোপ হল তার সম প্রজাতি আফ্রিকার দক্ষিণ পশ্চিমের মাদাগাস্কার দ্বীপের সমুদ্রে পাওয়া সিলাকাস্ট।

বাংলা কল্পবিজ্ঞান কাহিনি নির্মাণে প্রেমেন্দ্র মিত্র একজন দক্ষ কারিগর। বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহ বাড়ানো ও বিজ্ঞান মনস্কতা চর্চায় তিনি পথপ্রস্তুত। তার ঘনাদার গল্পগুলি পাঠ ও বিশ্লেষণ করলেই বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন হবে বলে আশা করি।

Reference:

১. মিত্র, প্রেমেন্দ্র, *ঘনাদা সমগ্র* (২য় খন্ড), সুরজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), ২য় সং, কলিকাতা : আনন্দ, ‘টল’, পৃ. ৫৯

২. ঐ, 'কালো ফুটো সাদা ফুটো', পৃ. ৬২২
৩. ঐ, পৃ. ৬২২
৪. ঐ, 'হ্যালির বেচাল', পৃ. ৪২০
৫. ঐ, 'মৌ-কা-সা-বি-স থেকে রসোমালাই', পৃ. ৩৩৩
৬. ঐ, পৃ. ৩৩৪
৭. ঐ, 'মঙ্গল গ্রহে ঘনাদা', পৃ. ৪৮৪
৮. ঐ, পৃ. ৪৮৮
৯. ঐ, পৃ. ৪৯২
১০. ঐ, পৃ. ৪৪৪
১১. ঐ, 'তেল দেবেন ঘনাদা', পৃ. ৫১৪
১২. ঐ, পৃ. ৫১৬
১৩. ঐ, 'মাকাতার টোপ', পৃ. ৫৯১
১৪. ঐ, পৃ. ৫৯১

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

- প্রেমেন্দ্র মিত্র, *ঘনাদা সমগ্র (১ম খন্ড)*। সুরজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদনা), ২য় সং, কলিকাতা : আনন্দ, ২০০০
- প্রেমেন্দ্র মিত্র, *কিশোর সাহিত্য সম্ভার*, কার্তিক ঘোষ (সম্পাদনা)। ২য় মুদ্রণ। কলিকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০০২,
- প্রেমেন্দ্র মিত্র, *কল্পবিজ্ঞান সমগ্র*, সুরজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা.), কলিকাতা : দেজ পাবলিশিং।

সহায়ক গ্রন্থ :

- পল্লব সেনগুপ্ত। *লোক সংস্কৃতির সীমানা- স্বরূপ*। কলিকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৫৯
- রবীন বল। *বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা*। সোমিলা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন।
- M.H.ABRMS. *A Glossary of Literary Terms*. Seventh edition. HEINLE & HEINLE, USA, 1999.
- Suparno Banerjee. *Indian Science Fiction- Patterns, History and Hybridity*. University of WALES press, 2020.
- Shweta Khilananani, Ritwick Bhattacharjee (edited). *Science Fiction in India- Parallel worlds and Post colonial Paradigms*. Bloomsbury India, 2022.

সহায়ক প্রবন্ধ :

- শ্যামল কুমার মজুমদার, *বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের ক্রমবিকাশ*। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কার্তিক- পৌষ, ১৩৮২।
- সিদ্ধার্থ ঘোষ। *সায়েন্স ফিকশন*, কল্পবিশ্ব প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ও তৃতীয় সংখ্যা, মে ২০১৯ ও জুন ২০১৯।
- Bodhisattva Chattopadhyay. *Speculative Utopianism in Kalpavigyan : Mythologerm and Womens Science fiction*. Foundation Essay prize Winner 2017.
2016. *On the Mythologerm : Kalpavigyan and the Question of Imperical science*. *Science Fiction studies*, 43.3:435-38.
- Suparno Banerjee. *Other Tomorrows : Post coloniality, Science fiction and India*. Unpublished PhD dissertation. Lousiana : Lousiana State University.
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Science_fiction date 10/11/2021
- www.kalpabiswa.in dated 10/11/2022